মুখোশের আড়ালে
চড়িদার ছৌ

উৎপল পাল

ছোট্ট উদিতার চোখে ফেরিওয়ালার লাঠিতে ঝুলতে থাকা মুখোশের প্রতিবিম্ব আর না পাওয়ার বেদনা, বাবা চাইলেও মায়ের প্রতিরোধে যখন তা প্রায় নাগালের বাইরে, তখনই আসরে দাদুর প্রবেশ এবং মধুরেণ সমাপয়েত, উদিতার মুখে মুখোশের আনন্দ। মনে মনে বাবা খুশি আর মায়ের মুখে বিরক্তির ভ্রূকুঞ্চন, আসলে মায়ের কাছে এটা বাজে খরচ হলেও, উদিতার চোখের উজ্জ্বলতা আর হাসি অন্য গল্পের ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

আমরা প্রত্যেকেই প্রচুর অর্থ ব্যয়ে, মনের মতো মুখোশ এঁটে নিতে চাই 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'র ঢঙে বলাই যায়, "মুখ ঢেকে যায় রঙিন মুখোশে।" কিন্তু সেই মুখোশের অনেকটাই, রোজকার মলিনতায় ধূসর। যত বেশী দামের প্রলেপই হোক, ধরা পড়ে না শিল্পী স্বত্ত্বার কোনো প্রকাশ। বরং মানুষের দিনযাপনের মুখোশ বড়ই প্রাণহীন, বড়োই বিবর্ণ।

তাই আমরা বারেবারেই ছুটে যাই যাত্রা, নাটক, থিয়েটার কিংবা গ্রাম্য ছৌ এর আসরে, একটু আনন্দের একটু ভালোলাগার খোঁজে। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বোকা বাক্সের দাপট আর অন্তর্জালের চোরাবালিতে প্রতিদিন একটার পর একটা লোকশিল্প ফসিল হয়ে যাচ্ছে। তারপর কোন এক ওয়েবসাইটে খুঁজে বার করতে হচ্ছে তার প্রাক্তন হয়ে যাওয়া অস্তিত্ব।

এমনই একটি লোকশিল্প ছৌ, যা ক্রমশই অস্তিত্বের সংকটে। যদিও এই সময়ের প্রেক্ষিতে বলাই যায়, পরিস্থিতি একটু স্থিতিশীল। ছৌ কিংবা ছো যাই বলা হোক, এই নৃত্যশৈলীর বর্তমান পৃষ্ঠপোষক প্রধানত বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মেলা কমিটিগুলি আর কোলকাতার বাবুরা। এই নাচের মূল আকর্ষণ এর মুখোশ, এত রঙীন আর প্রাণবন্ত যে লোকায়ত পুরাণ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর সেই মুখোশের ধাত্রীগৃহ পুরুলিয়ার চড়িদাই হল আমাদের এবারের চাঁদমারী।

এক শনিবারের জঙ্গলমহলে (বাসের নাম) রওনা দিলাম। বাসের নামটি বোধহয় যাত্রাপথের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। উজ্জ্বল আর আমি, দুই জিজ্ঞাসু তপনদা ছাড়াই বারোমাইলের খাড়াই পথে মন খারাপের কবলে। বিশেষ কাজ থাকায় তিন কমরেডসের বদলে দুয়ের সমন্বয়। বাস ক্রমশ পড়াডি মোড় ছাড়িয়ে তালপাত, বড়কদম ছুঁয়ে বান্দোয়ানের পথে। নামগুলো কি সুন্দর, তালপাতা কিংবা বট আর কদমকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

বলরামপুর বাসস্ট্যান্ডে আমরা কবি রাজীব ঘোষালের খবর পেলাম, তখনও গাড়িতে চাপেনি সে। শেষ পর্যন্ত পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকেই ফিরতে হল তাকে, ক্রমশ একা হয়ে যাওয়া আমরা আরও গভীর বিষণ্ণ হলাম। যাইহোক একটি টাটা হাতিতে শুরু হল চড়িদা যাত্রার আন্তম পর্ব, পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে বারো।

মধ্য নভেম্বরেও শীত লুকিয়ে, খুলতে হলো শীতবস্ত্র। আটচালার সামনে গাড়ি থেকে নামতেই চোখে এলো ছৌ কর্মশালা। একটা দুটো নয়, বেশ কয়েকটা দোকানে পুরোদমে কাজ চলছে। বলা হয়নি, বাগমুন্ডি স্ট্যান্ডে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বিশ্বজিৎ বিষ্টু, ঝকঝকে এক তরুণ। যার বাবার বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই "চড়িদা মুখোশ ঘর" এর স্বত্ত্বাধিকারী ধরণীধর বাবুর সঙ্গে আলাপ।

কথায় কথায় উঠে এলো কদ্দিন উনি এই কাজে। হালকা হাসিতে অকপট মানুষটি জানিয়ে দিলেন হাতেখড়ি শৈশবেই, বাবার হাতে। নকুল দত্তের নয় ছেলের একজন তিনি, আর এই নকুল দত্ত ছিলেন ছৌ- মুখোশের তুখোড় কারিগর। অশীতিপর মানুষটি এখন অবসরে, কারণ এ বড়ো সূক্ষ্ম কাজ। বয়স যে কখন সেই দক্ষতা কেড়ে নেয়, তা তিনিই জানেন! এও জানা গেল এই গ্রামের প্রায় একশো ঘর মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। ভালো লাগলো, মনে পড়ে গেল বিষ্ণুপুরের পাঁচমুড়া আর বাঁকুড়ার বিক্‌নার কথা। ধরণীবাবুর ভাই শ্যামলবাবুই আসলে বিশ্বজিতের বাবার বিশেষ বন্ধু, তার কাছে জানলাম কলা বিভাগে মাষ্টার ডিগ্রী করেও চাকরি বাকরির বিশেষ চেষ্টা করেন নি, লেগে পড়েছিলেন এই কাজে। তারপর সময় এগিয়েছে, মাথার চুলে লেগেছে বয়সের রং। সঙ্গে উজ্জ্বল হয়েছে মুখোশের রংও।

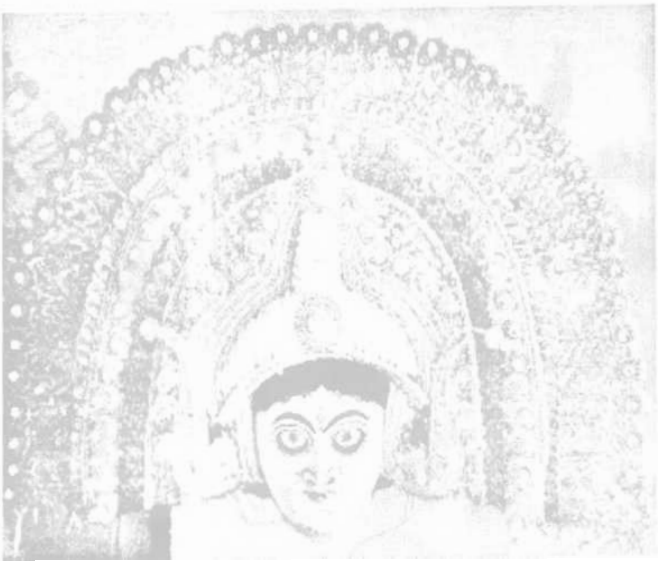

"আচ্ছা কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়?" প্রশ্নের উত্তরে ধরণীবাবু জানালেন কাঠের পাটা (পাটাতন), মাটি, মোটা ধরণের কাগজ, ময়দার আটা প্রভৃতি। প্রথমে পাটার উপর তৈরী করা হয় মাটির মূল ছাঁচ, তার উপর ছাই ছড়িয়ে শুরু হয় আঠা কাগজের সহযোগে পরত লাগানো। এই পরত প্রায় ১৪ থেকে ১৬ বার হলে, মুখোশ তৈরীর দ্বিতীয় পর্ব শেষ। এরপর শুকনো হলে তার উপর পড়ে মাটির হালকা প্রলেপ। আর ঠাপি দিয়ে পালিশ। এবার সূর্যের আলোয় শুকনো হবার পালা, প্রায় দিন তিনেকের ধাক্কা। এইভাবে একটা মুখোশ বাজারজাত হতে প্রায় দিন পাঁচ লেগে যায়।

বাগমুন্ডি ব্লকের সিন্দ্রি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই চড়িদা গ্রামে নয় নয় করে প্রায় খান দশেক দোকান, কোনোটার নাম 'মনোরঞ্জন মুখোশ ঘর' তো কোনোটার নাম 'মানভূম মুখোশ ঘর'।

উজ্জ্বলের প্রশ্ন "পরবর্তী প্রজন্ম কি এই কাজে আগ্রহী?" উত্তরে ছেলে সনৎ-এর দিকে আঙুল বাড়ালেন, দেখলাম গভীর মনোযোগে সে ঠাপি দিয়ে শেষ পালিশের কাজটি

সারছে। তারপর নিজেই বলেলেন "হ্যাঁ, অনেকেই এগিয়ে আসছে। আর চাকরি বাকরিই বা কই?"

"কেমন চলছে আপনাদের জীবন, ঘর গেরস্থালী ।"

ধরণীবাবু হাসছিলেন, উত্তর এল শ্যামলবাবুর কাছ থেকে 'ওই আর কি, চলে যায়। গ্রাম্য শিল্পীদের যেমন চলে।'

এরই ফাঁকে আমার ক্যামেরায় বন্দী দোকানের দীনহীন দেওয়ালে ঝুলতে থাকা অসামান্য মুখোশ, যার কোনোটা দুর্গার, কোনোটা গণেশের, কোনোটা ব্রহ্মার তো কোনোটা বা অসুরের। কি অপূর্ব এই কাজ, অজান্তেই বেরিয়ে এসেছিল 'অসাধারণ'। ধরণীবাবু মিটি মিটি হাসছিলেন, সন্তানের প্রশংসায় যেমন খেলে যায় বাবার চোখে মুখে।

ফের উজ্জ্বলের প্রশ্ন 'এই গ্রামে কদ্দিন এই কাজ হচ্ছে?' 'তা বলতে পারবো না, তবে আমার দাদুর আমল থেকে হচ্ছে এটুকু শুনেছি' - বললেন ধরণীবাবু। ধরণীবাবুর বয়স আন্দাজ ৫৩/৫৪, মনে মনে হিসেব কষলাম প্রায় দেড়শো বছর কিংবা তারও বেশী। হৃদয় থেকে বেরিয়ে এলো নি:শব্দ শ্রদ্ধা।

শ্যামলবাবু বল্লেন 'চলুন গ্রামটা ঘুরে দেখবেন, আরও একটা বিস্ময় আপনাদের অপেক্ষায়।' হেঁটে একটু এগিয়ে একটা স্ট্যাচুর সামনে দাঁড় করালেন, চোখ যেতেই রোম খাড়া। এ তো গম্ভীর সিং মুড়া'র পূর্ণাবয়ব মূর্তি, নীচে খোদাই অক্ষরে তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এই ভদ্রলোকই তো ছৌ-এর পৌরোহিত্যে ইতিহাস হয়ে আছেন। আর ছৌ-এর ইতিহাসকে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তাঁর হাত ধরেই তো গ্রামীণ ছৌ হয়ে উঠেছে সমগ্র পৃথিবীর। শ্যামলবাবু আঙ্গুল তুলে ধরলেন জমির আল ধরে এগিয়ে আসা মানুষটির দিকে, ইনি কার্তিক সিং মুড়া। গম্ভীর সিং মুড়া'র আত্মজ।

আমি এগিয়ে গেলাম, জানালাম প্রকৃত উদ্দেশ্য। শুনে নিরাসক্ত কার্তিক বল্লেন 'কি হবে লিখে? এতে আমাদের কিই বা লাভ?' লাভ-লোকসানের উদ্দেশ্যে তো এই লেখা নয়, প্রকৃত তথ্য জানানোর উদ্দেশ্যেই ধান ভানতে শিবের গীত। কার্তিকবাবু জানালেন 'ডি এম., এস.ডি.ও ছাড়াও প্রশাসনিক কর্তারা সবাই জানেন আমাদের পরিবারের কি অবস্থা। দেখতে পাচ্ছেন সামনের মাটির উঠোন আর ভাঙ্গা বাড়ি, ওটাই বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে।'

নিশ্চুপ আমি। কার্তিকবাবু বলতে লাগলেন 'আমার মা চিন্তামণি বার্ধক্য ভাতা পান, সে তো ষাট বছরের প্রবীণ সবাই পায়। তাহলে শিল্পের জন্য জীবন দেওয়া আমার স্বর্গত: বাবার জন্য কি করা হল সরকারের তরফে?" উত্তরহীন আমি শুনতে লাগলাম ওর বক্তব্য। খানিক নীরবতার পর আমার প্রশ্নের উত্তরে জানলাম কার্তিকবাবুরা তিন ভাই। কার্তিক, গণেশ, পরশুরাম। কার্তিকবাবু ১৯৮৫ তে প্যারিস আর ১৯৯১ তে জাপানে গিয়েছেন ছৌ এর সৌজন্যে, পেয়েছেন মানুষের অকুণ্ঠ অভিনন্দন। গানের ভাষা তো গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু নাচের ভাষা সর্বজনীন। অভিমানী কার্তিক সিং ফিরে যাচ্ছিলেন ঘরে, তাঁর মুখ জুড়ে তখন না পাওয়ার বেদনায় ছৌ-এর সাতরঙ।

আমি, উজ্জ্বল, শ্যামলবাবু আর বিশ্বজিৎ মন্থর পায়ে ফের চড়িদা বাজারের দিকে। 'মানভূম মুখোশ ঘর' এর সাইনবোর্ডে দেখলাম অনিল সূত্রধরের নাম, নীচে তাঁর বিদেশযাত্রার বিবরণ। শ্যামলবাবু জানালেন, অনিলবাবু হলেন প্রয়াত গম্ভীর সিং মুড়া'র ম্যানেজার। তাঁকে জানিয়ে তবেই যোগাযোগ করতে হতো গম্ভীর সিং - এর সঙ্গে।

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ সূত্রধরের কর্মশালা '৺ নগেন্দ্রনাথ মুখোশ ঘর' এর সামনে এসে দাঁড়ালাম। চকিতে চোখ গেল দোকানের দেওয়ালে। ঢুকলাম ভিতরে, নগেনবাবুর ছেলে রাজুর সঙ্গে শুরু আলাপচারিতা। জানা গেল মুখোশের সাজসজ্জায় ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পাতা আসে কসবার হালতু থেকে, জরি মোতি বড়বাজারের । আবারও মহানগরী। বিক্রিবাট্টার প্রশ্নে জানা গেল, সাধারণত: বাইরে থেকে ক্রেতা আসেন। এছাড়া মেলা মহোৎসবে দোকানও দেওয়া হয়।

বোঝা গেল, সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলো ভীষণভাবেই ঋষিকল্প, তাদের কাছে মুখোশই জীবন। সত্যিই তো কর্মই যেখানে জীবন সেখানে ভালোবাসার অভিমুখ অবশ্যই শিল্প, 'প্লেন লিভিং, হাই থিংকিং,' এখানে 'প্লেন লিভিং প্লেন থিংকিং,'। নগরের অঢেল চাহিদা এখানে ভীষণ ভাবেই অনুপস্থিত কারণ হয়তো সেই অতি পুরনো অর্থনীতি, যার সরবরাহে প্রশাসনের অনীহা। তাই শ্যামলবাবু বলে ওঠেন 'সামান্য ঋণের টাকায় কি এমন উন্নতি হবে, বরং সুদের বোঝা ঠেলতেই মাথা খারাপ। এই ভালো আছি।'

গণেশ বন্দনা দিয়ে শুরু হয় ছৌ নাচের পালা যেখানে মহিরাবন বধ প্রভৃতি পালার প্রদর্শন হয়ে থাকে। ছৌ নামকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে। কারো মতে সংস্কৃতি ছায়া থেকে এসেছে ছৌ, কেউবা বলেন শিকার উৎসবের সময় 'ছো ছো ছো' উচ্চারণ থেকে। একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে ছৌ সাধারণত তিন ধরণের —

১) পুরুলিয়া ছৌ : রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ
২) সরাইকেল্লা ছৌ : রাজ্য : বিহার
৩) ময়ূরভঞ্জ ছৌ : ওড়িশা

এই নৃত্যশৈলী মূলত যুদ্ধের, যা দর্শনেই মালুম হয়। এই নাচের তৎকালীন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাগমুন্ডির রাজ পরিবার। ঢোল, ধামসা, চচ্চড়ি সহযোগে নাচ এর সময় নৃত্যশিল্পীদের শূন্যে পাক খাওয়া তাদের শারীরিক দক্ষতার সদর্প ঘোষণা। খোলা মাঠে এই দক্ষতা প্রদর্শন আদৌ সহজ নয়, কিন্তু মঞ্চের সুখ-চৌহদ্দি ছাড়াই যে মনোরঞ্জন সম্ভব তার জ্বলন্ত উদাহরণ ছৌ নাচিয়ের দল।

এটা বলা আদৌ সমীচিন নয় সবই সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এর পরেও যে প্রশ্নটা থেকেই যায় সেটা হল, এই নৃত্যশৈলী তো এ বঙ্গের সম্পদ, সেই সম্পদের প্রসার এবং প্রচারেও তো সরকারের যথাযথ ভূমিকা থাকবে। কিন্তু সত্যিই কি সেটা আছে, প্রশ্ন ছৌ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের। তবে সঙ্গে এই আশাও প্রবল সোনার রং যেমন ফিকে হয় না তেমন আমাদের ঘরের এই নাচ, মাটির এই নাচ মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাবেই, রয়ে যাবে আমাদের প্রাণের নাচ হয়েই।

বেশ ক্ষিধে পেয়েছে, কব্জি উল্টে ঘড়িতে নজর যেতেই বোঝা গেল চড়িদাকে বিদায় জানাতে হবে। বিশ্বজিৎকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর উজ্জ্বল আবার টাটা হাতির সওয়ার। বাগমুন্ডি স্ট্যান্ডের একটা লাইন হোটেলে ক্ষুন্নিবৃত্তি শেষ হলে বিশ্বজিৎকে বিদায় জানালাম। ও বলছিল এই প্রথম নাকি ও বাগমুন্ডির কোনো হোটেলে খেল, কারণ এখানেই ওর বাড়ি। আমাদের যেতে আমন্ত্রণ জানালেও, তা গ্রহণ করা ছিল নিতান্তই অসম্ভব। বাড়ি যাবার তাড়াটা অনুভব করছিলাম। হাতি ছুটতে লাগল, গতি অবশ্যই চিতার নয়। এবার আমরা মানভূম স্টেশনে। মুখোশ থেকে অনেক দূরে কোনো এক জনপদে আমাদের মুখে উঠবে যুৎসই চরিত্রের মুখোশ, যার অনুশীলন এ্যাদ্দিন ধরে আমরা করে আসছি। দেখার বিষয় সেই মুখোশ পরেও ছৌ-কে চিনতে পারি কি না? আর সেটাই আমাদের আসল পরীক্ষা।